আতঙ্কের দেশে

অনমিত্র চট্টোপাধ্যায়

লিফ্টের তেল না-খাওয়া কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ করতে হল বেশ জোরে। আর তার বিকট শব্দ যেন জনমানবহীন আবাসনের দালানে, বারান্দায়, ঘরের দরজায় ঘা খেয়ে খেয়ে ঘুরে ফিরে এসে ব্যোমকে দিল একেবারে।

ঢাকায় তখন শেষ বিকেলের মরা আলো। মন-খারাপ-করা হলুদ রঙের ২০ তলা বিশাল আবাসনটির ন'তলায় আমরা দাঁড়িয়ে। সামনে সরু লবির দু'পাশে সারি সারি বন্ধ দরজা। এক-একটি দরজা এক-একটি ফ্ল্যাটের। নম্বর নিশ্চয়ই লেখা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই বেশ ঝাপসা। হলুদ বালবের আলো একটা জ্বলছে বটে। কিন্তু তাতে ধাঁধা যেন আরও বেড়েছে। ফোন করেই উঠেছি। কিন্তু এ বার কোন দিকে যাই?

খুট করে একটা দরজার আধখানা খুলে মুখ বাড়ালেন গোলগাল এক মাঝবয়েসি মহিলা। পরনে হিজাব। আগন্তুককে দেখে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে মরিয়া হয়েই ছুড়ে দিলাম প্রশ্ন— অমুক নম্বরের ফ্ল্যাট?

জবাব তো মিলল না-ই, বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল মাঝবয়সিনীর। আধখোলা দরজা বন্ধ হল বেশ শব্দ করে।

সেই সময়েই উল্টো দিকের আর একটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল পুরোটা। পায়জামা আর ঘরোয়া ফতুয়া পরা এক রোগা-পাতলা বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন, আসুন আসুন!

ইনি বাংলাদেশের এক জন প্রখ্যাত নাট্যকার, লেখক ও শিল্পী। আগে শুধু নামটুকুই শুনেছি। কেমন দেখতে, ঠিক কত বয়স হতে পারে কোনও ধারণাই ছিল না। শুধু শুনেছি— তাঁর ছোট ভাই শেখ হাসিনা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী। ফোন করায় বলেছিলেন, অমুক রাস্তার অমুক আবাসনের এত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকি। চলে আসুন না! কথা বলা যাবে।

রাস্তাটা আমার চেনা। ঢাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। হোটেল থেকে হাঁটা পথ। আবাসনটি খুঁজে তার সামনে দাঁড়িয়ে ফোন করেছিলাম ওঁকে। বলেছিলেন— সিকিওরিটি গার্ডকে বললে লিফ্ট দেখিয়ে দেবে। উঠে আসুন ন'তলায়।

কোথায় সিকিওরিটি গার্ড! তাকে খোঁজার চেয়ে লিফ্ট খুঁজে উঠে পড়েছিলাম।

ফ্ল্যাটে ঢুকতেই তিনি বললেন, বসুন চা করে নিয়ে আসি। ফোন পেয়েই জল চাপিয়ে দিয়েছি।

উঁকি-ঝুঁকি মেরে বুঝলাম একাই থাকেন অকৃতদার বৃদ্ধ। আলমারি ছাপিয়ে মাটিতেও উপচে পড়েছে বই। তবু ঘরদোর বেশ পরিপাটি।

চায়ের কাপ হাতে ঢুকে বললেন, ''বড় আতঙ্কে থাকি বুঝলেন। রোজ হুমকি, রোওওজ! বাড়ির বাইরে বেরোতে পারি না। একটু দোকানে যাব, সে সাহসটুকুও হয় না। একটা ছেলে আসে, সে-ই বাজার দোকান করে দেয়। পুলিশকে জানিয়েছি, কিন্তু তাতে হুমকি কমার বদলে বেড়েই গিয়েছে। ফোনের নম্বর বদলাতে পারি না, বাইরের মানুষের কাছে ওই টিকিটুকুই তো বাঁধা আছে আমার! অনেকে ফোনেই তবু খোঁজখবর নেন।''

চুমুকে চুমুকে কমে আসছে দুধ-ছাড়া সুন্দর গন্ধ ওঠা মির্জাপুরের চা। বৃদ্ধ বসেছেন বাঁ পায়ে ডান পায়ের প্যাঁচ দিয়ে জড়সড়ো হয়ে। এক মাথা সাদা চুল, দাড়িগোঁফ কামানো। কথায় কোনও আঞ্চলিক টান নেই।

বলে চলেন, ‘‘আগে রাস্তায় কোপাতো, এখন তো কলিং বেল টিপে বাড়িতে ঢুকেই কুপিয়ে দিয়ে যায়! ভরসা কী বলুন। কী ভাবে যে রয়েছি।’’

দৃষ্টি কখনও চায়ের কাপে, কখনও তা থেকে উঠে অনির্দেশ শূন্যতায়...

‘‘আমি ধর্মাচরণ করি না ঠিকই, নুর দাড়ি রাখি না, চোখে সুরমা দিয়ে নমাজ পড়তে মসজিদে যাই না। নিজের লেখাপড়া, নাটক, ছবি আঁকা নিয়ে থাকি। কিন্তু ইসলামকে আঘাত দিয়ে কখনও কিছু তো আমি লিখিনি। তবে আমাকে ওরা কেন টার্গেট করল বলতে পারেন?’’

বললাম, ‘‘তারা যদি আপনার লেখাই পড়বে, আপনার নাটক দেখবে, তবে কোনও মানুষকে মারার জন্য হুমকি কেন দেবে? তারা তো টার্গেট বাছেনি, অন্য কেউ টার্গেট বেছে তাদের দেয়। তবে এতটা আতঙ্কিত হওয়ার সত্যিই কী কোনও কারণ আছে? হতে পারে তো কিছুটা আপনার মনের ভুল!’’

হাসলেন বৃদ্ধ। ‘‘পরশু শেষ বার বেরিয়েছিলাম। ওষুধ কিনতে। দিনে দুপুরে। একটা বখাটে ঠেলে মোটর বাইক হাঁকিয়ে ব্রেক কষলো ঠিক আমার ঘাড়ের কাছে। মুখ বেঁকিয়ে বলল— তোরে কাইট্যাই ফ্যালামু। তার পরে দুদ্দাড় বাইক হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। বলুন তো, রাস্তায় এত লোক থাকতে আমাকে কেন সে কথাটা বলতে গেল? আপনি বলবেন মনের রোগ? অনেকেই বলে। হয়তো ঠিকই সেটা। কিন্তু এই রোগটা তারা ধরিয়ে দিতে পেরেছে। এই দেশ স্বাধীন করার জন্য আমিও লড়াই করেছি। আমি মুক্তিযোদ্ধা। আজও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। কিন্তু এ কোন দেশে আমরা আজ বাস করছি? কী আতঙ্ক নিয়ে বাস করছি? সরকার যে দলেরই হোক, বাংলাদেশের সমাজ আজ কারা শাসন করছে?’’

বৃদ্ধকে বললাম, ‘‘কিন্তু এ ভাবে একা থাকলে আতঙ্ক তো আরও চেপে বসবে। প্রতিবেশীরা আসেন না? খোঁজখবর নেন না?’’

সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ শিল্পী। রান্নাঘরে উঠে গিয়ে চায়ের কাপ রেখে এলেন। তার পর বললেন, ‘‘প্রতিবেশীদের সব জানিয়েছিলাম আমি। তার ফল হয়েছে, আবাসনের শ’খানেক পরিবারের মধ্যে তিন-চারটি পরিবার ছাড়া বাকিরা আমাকে দেখলে দ্রুত পায়ে সরে পড়ে। কেউ কথা বলে না, পাছে টার্গেট হয়ে পড়ে। এক সময়ে প্রতিবেশীরা বড়াই করে বলত, তাদের আবাসনে আমি থাকি। তাদের কাছে আজ আমি আপদ। সকলেই বিরক্ত যে, আমার জন্য তাদের আবাসনে একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। রক্তের ছিটে যেন তাদের গায়ে না-লাগে।’’

উঠে তাক থেকে নিজের লেখা একটা অনুবাদ বই পাড়লেন শিল্পী। ঝরনা কলমে সই করে সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ‘‘আপনারা এসেছেন জেনেও দরজা খুলতে দেরি করছিলাম না আমি? তারও একটা কারণ আছে।’’

আবার এসে নিজের চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ। হেসে বললেন, ‘‘প্রতিবেশী ওই মহিলার অসীম কৌতূহল। লিফ্‌টের শব্দ হলে সচরাচর সে-ই আগে দরজা খোলে। অপরিচিতরা তার কাছেই জানতে চায় অমুক নম্বরের ফ্ল্যাটটা ঠিক কোথায়। আমি দরজার আড়াল থেকে সেটাই শুনতে চাইছিলাম। আপনি আমার ফ্ল্যাটের নম্বর বলতেই বুঝলাম আপনারা এসে গিয়েছেন। এ ভাবে আমার একটা সিকিওরিটি কভারও হয়ে যায়।’’

বললাম, ‘‘উনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। বরং বিরক্তি প্রকাশ করে সশব্দে নিজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।’’

শিল্পী বললেন, ‘‘আসলে আমার জন্য সে-ও খুব টেনশনে থাকে। শুনেছি এতে তার কোরান পড়া বেড়ে গিয়েছে। এক বছর আগেও তাকে হিজাব পরতে দেখিনি। এখন বাড়িতেও পরে থাকে। উদ্দেশ্য বোধ হয়— ঘাতকেরা যেন ভুল না-করে। আমার ওপর বিরক্তির কারণও সঙ্গত। এক দিন তো সরাসরিই আমাকে বলেছে— আপনে অন্য কোথাও গিয়া থাকতে পারেন না? আমরা বাল-বাচ্চা নিয়া থাকি!’’

বলে চলেন বৃদ্ধ, ‘‘বলছিলাম না— আপদ। আবাসনের অনেক লোকই আমাকে কার্যত খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছেন। আজ আমি খুন হয়ে গেলে তাঁরা এতটুকু চমকাবেন না। বরং শান্তি পাবেন— আর টেনশনে থাকতে হবে না। আমার সামনেই তাঁরা বলেন, অরা টার্গেট করলে তো বাঁচান্ যায় না। এখন শুধু দিন গনা।’’

কিন্তু আপনার এক ভাই তো শুনেছি মন্ত্রী। পুলিশে জানিয়েও কাজ হয়নি?

ম্লান হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। ‘‘নজরবন্দি হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিয়েটাই করে ওঠা হয়নি। ভেবেছিলাম নিজের খেয়ালেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। তাই প্রথমে পুলিশকে জানাতে দ্বিধা ছিল। সকলে বলায় রিপোর্ট করেছিলাম। থানা বলেছিল, সাবধানে থাকতে। সকলের জন্য আলাদা করে দেহরক্ষী দেবার সামর্থ পুলিশের নেই। আমিও সেটা চাইনি। কিন্তু আবাসনের সামনে থানা এক জন পুলিশকে মোতায়েন করেছে। তাতেও অবশ্য অনেক আবাসিকের আপত্তি। বলেছে, গোটা আবাসনটাই এতে টার্গেট হয়ে গেল। কিন্তু সকলেই বলে, ডিউটিতে থাকা পুলিশটিকে বিশেষ দেখা যায় না। তারও তো পরিবার আছে। কেউ হামলা করতে এলে লাঠি হাতে একা সে পারবেই বা কী করে!’’

বৃদ্ধ জানান, তবে থানা থেকে বাড়িতে আসার পরই অজানা নম্বর থেকে তাঁর মোবাইলে যে বার্তাটি আসে, তাতে লেখা ছিল— ‘‘তাগুত পুলিশ মুজাহিদদের রোষ থেকে তোকে বাঁচাতে পারবে না। এক কোপে তোর মাথা নামিয়ে সওয়াব উসুল করা হবে। শেষের ক’টা দিন তুই দ্বীনের পথে থাকতে চা।’’

হঠাত্ই কলিংবেল বেজে উঠল শিল্পীর বাড়িতে। তিনি সচকিত হয়ে দরজার দিকে তাকালেন। মরমে কেঁপে উঠলাম যেন আমরাও। অনুভব করলাম হিমস্রোত নেমে যাচ্ছে শিরদাঁড়া দিয়ে। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার পরে আরও দু’বার বাজল কলিং বেল। এ বার নিরুদ্বেগ বৃদ্ধ উঠে গিয়ে ‘হক আই’য়ে চোখ রাখলেন। তার পর একের পর এক তিনটে আগল খুলে দরজা ফাঁক করতেই এক কিশোর ঢুকে পড়ল মাথা চুলকোতে চুলকোতে। বলল, ‘‘কিছুতেই মনে থাকে না দুই বার বেল বাজাতে! এক বার বাজন দিয়ার পর খিয়াল হয়।’’

দরজা ফের বন্ধ করে শিল্পী জানালেন, এই কিশোরই তাঁর ফাই ফরমাস খেটে দেয়। পর পর দু’বার বেল বাজানোটা তার সিগন্যাল। কিন্তু প্রতিবারই ভুলে সে একবার বাজিয়ে ফেলে টেনশন ছড়ায়।

কথায় কথায় সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে অন্ধকার নেমেছে। বৃদ্ধ বললেন, অনেক দিন পরে গল্প করার লোক পেয়ে যেন ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আমরা অবশ্য উঠতেই চাই। আমার সঙ্গী ঢাকার তরুণ নিউরোসার্জেন সুব্রত ঘোষ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে আমার দিকে তাকায়। আমিও ইশারায় বলি, ওঠা যাক।

Medianest: Remembering Sandipta Chatterjee

A joint endeavour of Sandipta's friends and
School of Media, Communication and Culture, Jadavpur University

medlanest.org.in

কিছু ক্ষণ আগে কলিং বেলের আওয়াজ চোখে খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, অল্প সময়েই আতঙ্ক কী ভাবে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমাদের বুকের রক্ত মুখে উঠে এসেছিল। আমাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গায়ে কাঁটাও কি দিয়েছিল? তবে আমি ও সুব্রত ক্ষণিকের জন্য একে অপরের ভয়ার্ত মুখচোখ দেখে ফেলেছি।

লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম। শুনশান রাস্তা। অন্ধকার। পেছনে কি ছুটে আসছে কোনও বখাটে মোটরসাইকেল আরোহী? আড়চোখে দেখে দ্রুত হেঁটে পেরিয়ে গেলাম রাস্তাটা।

কারও মুখে কোনও কথা নেই।